بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ মে, ২০২১ মোতাবেক ০৭ হিজরত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। হযরত হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল, "হযরত উমর (রা.) সর্বদা ইসলামের ঘোর বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত ইসলামের বিরোধিতা করেছেন। একদিন তাঁর মনে ধারণা জন্মে যে, এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার ভবলীলা সাঙ্গ করে ফেললেই তো ভালো হয় আর এই ধারণা (মাথায়) আসতেই তিনি তরবারি হাতে তুলে নেন এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার মানসে বাড়ি থেকে বের হন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, উমর কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি হেসে বলেন, **'আগে নিজের বাড়ির খবর নাও'**। তোমার বোন ও ভগ্নিপতি তো তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি মিথ্যা কথা। সেই লোক বলল, নিজে গিয়ে দেখে নাও। হযরত উমর (রা.) সেখানে যান, (ঘরের) দরজা বন্ধ ছিল আর ভেতরে একজন সাহাবী (তখন) পবিত্র কুরআন পড়াচ্ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ হযরত উমর) কড়া নাড়েন। ভেতর থেকে তাঁর ভগ্নিপতি জানতে চান, কে? উমর উত্তরে বলেন, (আমি) উমর। তারা যখন দেখেন, উমর এসেছেন আর তারা জানতেন যে, তিনি ইসলামের ঘোর বিরোধী, তাই যে সাহাবী কুরআন পড়াচ্ছিলেন তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখেন। একইভাবে পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠাগুলোও কোন কোণায় লুকিয়ে ফেলেন– এরপর দরজা খুলেন। হযরত উমর (রা.) যেহেতু একথা শুনে এসেছিলেন যে, তারা অর্থাৎ তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি মুসলমান হয়ে গেছে। তাই তিনি এসেই জিজ্ঞেস করেন, দরজা খুলতে বিলম্ব করলে কেন? তাঁর ভগ্নিপতি উত্তরে বলেন, কিছুটা বিলম্ব তো হয়ই। হযরত উমর (রা.) বলেন, বিষয় এটি নয়, কোন বিশেষ কারণ তোমাদের দরজা খুলতে বিলম্ব করিয়েছে? (আর) আমি শব্দও পাচ্ছিলাম যে, তোমরা সেই সাবীর কথা শুনছিলে। {মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে সাবী বলতো।} তাঁর ভগ্নিপতি কথা ঘুরানোর চেষ্টা করেন কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র রাগ ধরে আর তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে প্রহার করার জন্য অগ্রসর হন। তাঁর বোন স্বামীর প্রতি ভালোবাসার কারণে মাঝখানে এসে দাঁড়ান। হযরত উমর (রা.) যেহেতু হাত তুলে ফেলেছিলেন আর হঠাৎ তাঁর বোন মাঝখানে এসে পড়েছিলেন তাই তিনি আর নিজের হাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি, তাঁর হাত সজোরে তাঁর বোনের নাকে আঘাত করে আর সেখান থেকে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে। হযরত উমর (রা.) আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। তিনি যখন দেখেন, আরবের রীতি বহির্ভূতভাবে তিনি মহিলার ওপর হাত তুলে ফেলেছেন, অর্থাৎ বোনের ওপর হাত তুলেছেন। (তাই) হযরত উমর (রা.) কথা ঘুরানোর জন্য বলেন, আচ্ছা আমাকে বল, তোমরা কি পড়ছিলে? বোন বুঝতে পারেন, উমর (রা.)'র মাঝে কোমল অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই তিনি বলেন, যাও; তোমার মত মানুষের হাতে আমি সেই পবিত্র জিনিস দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। হযরত

উমর (রা.) বলেন, তাহলে আমি করবো? বোন বলেন, সামনে পানি আছে– গোসল করে আসো তবেই সেই জিনিষ তোমার হাতে দেওয়া যেতে পারে। হযরত উমর (রা.) গোসল করে ফিরে আসেন। (তাঁর) বোন পবিত্র কুরআনের সেই পৃষ্ঠাগুলো যা তারা শুনছিলেন তা তাঁর হাতে তুলে দেন। হযরত উমর (রা.)'র মাঝে যেহেতু ইতিমধ্যে এক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাই কুরআনের আয়াত পাঠ করা মাত্রই তাঁর মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় আর সেই আয়াতগুলো পাঠের পর তিনি অবলীলায় বলে ওঠেন, **আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্**। এই বাক্য শুনে সেই সাহাবীও বাইরে বেরিয়ে আসেন যিনি হযরত উমর (রা.)'র ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। এরপর হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছেন? মহানবী (সা.) সেদিনগুলোতে বিরোধিতার কারণে একের পর এক স্থান পরিবর্তন করছিলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে তিনি দ্বারে আরকামে অবস্থান করছেন। হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ সে অবস্থায়ই অর্থাৎ যেভাবে নগ্ন তরবারি তিনি (কাঁধে) ঝুলিয়ে রেখেছিলেন সেভাবেই সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটা দেন। বোনের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, কোথাও আবার তিনি মন্দ উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন না তো! তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে আশ্বস্ত না করবে যে, তুমি সেখানে অপ্রীতিকর কোন কিছু করবে না। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি দৃঢ় অঙ্গীকার করছি, আমি সেখানে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবো না। হযরত উমর (রা.) সেখানে পৌঁছেন– যেখানে মহানবী (সা.) অবস্থান করছিলেন। সেখানে গিয়ে কড়া নাড়েন। মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা (রা.) ভেতরে বসে ছিলেন, ধর্মীয় আলোচনা চলছিল। কোন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, কে? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, আমি উমর। সাহাবীরা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! দরজা খোলা সমীচীন হবে না। কেননা, বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত হামযাহ্ (রা.) সদ্য ঈমান আনয়ন করেছিলেন, তিনি যোদ্ধা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, দরজা খুলে দাও। সে কী করে, আমি দেখব। অতএব, একজন গিয়ে দরজা খুলে দেয়। হযরত উমর (রা.) এগিয়ে আসলে মহানবী (সা.) তাঁকে বলেন, হে উমর! তুমি আর কতদিন আমার বিরোধিতা করতে থাকবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি বিরোধিতা করার জন্য আসি নি, আমি তো আপনার দাসত্ব বরণ করতে এসেছি। যে উমর (রা.) এক ঘণ্টা পূর্বেও ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, এক নিমিষেই (তিনি) উন্নত মর্যাদার মু'মিন হয়ে যান। হযরত উমর (রা.) মক্কার কোন নেতা ছিলেন না কিন্তু বীরত্বের কারণে যুব সমাজের ওপর তাঁর বেশ ভালো প্রভাব ছিল। তিনি যখন মুসলমান হন তখন সাহাবীরা (রা.) আবেগের আতিশয্যে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করেন। এরপর নামাযের সময় হলে মহানবী (সা.) নামায পড়তে চান তখন সেই উমর (রা.) যিনি দু'ঘণ্টা পূর্বে মহানবী (সা.)-কে হত্যার মানসে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, তিনি পুনরায় তরবারি বের করে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! খোদা তা'লার রসূল এবং তাঁর অনুসারীরা লুকিয়ে নামায পড়বে আর মক্কার মুশরিকরা বাইরে বুক ফুলিয়ে চলবে- এটা কীভাবে সম্ভব? আমি দেখবো, পবিত্র কাবাগৃহে আমাদেরকে নামায পড়তে কে বাধা দেয়। মহানবী (সা.) বলেন, এই আবেগ বা প্রেরণা খুবই উত্তম কিন্তু পরিস্থিতি এখনো এমন যে, আমাদের বাইরে বের হওয়া সমীচীন নয়।" **(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৪১-১৪৩)**

কিন্তু এরপর পবিত্র কাবাগৃহে নামাযও পড়া হয়, যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'ও বর্ণনা করেছেন, 'ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে কেবল দু'জনকেই বাহাদুর বা বীরপুরুষ বলে মনে করা হত। একজন হলেন, হযরত উমর (রা.) আর অপরজন, হযরত আমীর হামযাহ্ (রা.)। তারা দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আমরা ঘরের ভেতর লুকিয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা পছন্দ করি না। কাবার প্রতি আমাদেরও অধিকার আছে তাই আমরা আমাদের অধিকার গ্রহণ না করার এবং প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত না করার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। অতঃপর মহানবী (সা.) (যিনি) কাফিরদেরকে নৈরাজ্যের অপরাধ থেকে বাঁচানোর জন্য বাড়িতেই নামায পড়তেন, ইবাদতের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাগৃহে যান। এ সময় তাঁর একপাশে হযরত উমর (রা.) তরবারি ধারণ করে হাঁটছিলেন আর অপর পাশে হযরত আমীর হামযাহ্ (রা.), আর এভাবে মহানবী (সা.) পবিত্র কাবাগৃহে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। **(খুতবাতে মাহমুদ, ২৩তম খণ্ড, পৃঃ ১০)**

কুরাইশদের মাঝে যখন হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা চরম ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই উত্তেজনার বশেই তারা হযরত উমর (রা.)'র বাড়ি অবরোধ করে। হযরত উমর (রা.) বাইরে আসলে তাঁর (রা.) চতুর্দিকে লোকদের ভীড় জমা হয়। (তাদের মধ্যে) উত্তেজিত কেউ কেউ তাঁর (রা.) ওপর আক্রমণ করতেও উদ্যত ছিল। কিন্তু তিনি (রা.) বীরবিক্রমে তাদের সম্মুখে অবিচল থাকেন। এমতাবস্থায় মক্কার শীর্ষনেতা আ'স বিন ওয়ায়েল সেখানে এসে এত মানুষের জটলা দেখে স্বীয় নেতাসুলভ ভঙ্গীতে বলে, কী হয়েছে? লোকেরা বলে, উমর (রা.) সাবী হয়ে গিয়েছে। সেই নেতা সুযোগ বুঝে বলল, ঠিক আছে, এমনটি হলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামার কোন প্রয়োজন নেই। উমর (রা.)-কে আমি আশ্রয় দিচ্ছি। এ কথার প্রেক্ষিতে আরবের রীতি অনুসারে জনতাকে নীরবতা অবলম্বন করতে হয় এবং ধীরে ধীরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর হযরত উমর (রা.) বেশ কিছুদিন নিরাপদেই থাকেন কেননা, আ'স বিন ওয়ায়েলের নিরাপত্তার কারণে কেউ তাঁর সাথে সংঘাতে জড়াত না। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র আত্মাভিমান খুব বেশি দিন পর্যন্ত এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারে নি। তাই অল্প কয়েক দিন যেতে না যেতেই তিনি (রা.) আ'স বিল ওয়ায়েলকে গিয়ে বলেন, আমি তোমার আশ্রয় থেকে মুক্ত হচ্ছি। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর আমি মক্কার অলি-গলিতে কেবল মার খেতাম নইলে মারতাম অর্থাৎ মানুষের সাথে মারামারি বা সংঘাত লেগেই থাকত কিন্তু হযরত উমর (রা.) কখনও কারো সামনে দৃষ্টি অবনত করেন নি। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এম (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃঃ ১৫৯}**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'দেখ! মহানবী (সা.)-এর কেমন ঘোরতর শত্রু ছিল কিন্তু (ঈমান আনার) পর তাঁদের মাঝে কীরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তাদের কেবল সংশোধনই হয়নি বরং তাঁরা (রা.) আধ্যাত্মিকতার এমন উন্নত মার্গে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাদেরকে চেনাও দুষ্কর হয়ে পড়ে।' অর্থাৎ তাদের কায়া পাল্টে গিয়েছিল (যে কারণে) চেনাই যেত না যে, এরাই তারা। 'হযরত উমর (রা.) ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন তখন তাঁর (রা.) মাঝে এমন পরিবর্তন সাধিত হয় যে, ধর্মের খাতিরে নিজ প্রাণ হুমকির মুখে ঠেলে দেন আর দিনরাত ইসলাম সেবায় রত হন।' **(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, **"হযরত উমর (রা.)'র প্রতিই লক্ষ্য করে দেখ! তাঁর (রা.) মাধ্যমে ইসলামের কত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এক যুগে তিনি (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন নি আর চার চারটি বছর বিলম্বিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা খুব ভালো জানেন, এর নেপথ্যে কি প্রজ্ঞা বা রহস্য ছিল। আবু জাহল এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান করছিল যে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করতে পারে। তখন হযরত উমর (রা.) শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের কারণে সুপরিচিত ছিলেন। তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে একমত হয় আর চুক্তিপত্রে হযরত উমর (রা.) এবং আবু জাহল স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, উমর যদি {মহানবী (সা.)-কে} হত্যা করতে পারে তাহলে তাকে এই পরিমাণ অর্থ দেয়া হবে।"** তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার কুদরত ও লীলা দেখ! সেই উমর (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-কে এক সময় শহীদ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় পক্ষান্তরে সেই একই উমর মুসলমান হয়ে স্বয়ং শহীদ হয়ে যান। কত অদ্ভুত ছিল সেই যুগ! মোটকথা তখন এই চুক্তি হয়েছিল, (উমর বলেন) আমি তাঁকে হত্যা করব। এই লিখিত চুক্তির পর মহানবী (সা.)-কে হত্যার দুরভিসন্ধি নিয়ে তাঁর সন্ধানে হযরত উমর (রা.) রাতের আঁধারে ঘুরে বেড়াতেন, কোথাও একাকী বা নির্জনে পাওয়া গেলে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করবেন। লোকজনকে তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মদ (সা.)-কে একাকী কোথায় পাওয়া যাবে? লোকেরা বলে, মুহাম্মদ (সা.) মাঝ রাতের পর পবিত্র কাবাগৃহে গিয়ে নামায পড়েন। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) খুবই আনন্দিত হন। তাই, তিনি কাবাগৃহে এসে ওঁত পেতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর নির্জন জঙ্গল থেকে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" র** ধ্বনি শুনতে পান। আর তা মুহাম্মদ (সা.)-এরই ধ্বনী ছিল। এই শব্দ শুনে এবং এটি বুঝতে পেরে যে, তিনি (সা.) এদিকেই আসছেন, হযরত উমর (রা.) আরো সতর্কতার সাথে লুকিয়ে পড়েন এবং এই পণ করেন যে, তিনি (সা.) সিজদায় গেলেই তরবারি দিয়ে তাঁর পবিত্র দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে ফেলব। মহানবী (সা.) এসেই নামায পড়া শুরু করেন। এরপরের ঘটনা হযরত উমর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এরপরের ঘটনা হযরত উমর (রা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) সিজদায় এমনভাবে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন যে, আমি শিউরে উঠতে থাকি বা কাঁপতে থাকি। দোয়াতে তিনি (সা.) আরো বলেন, **'সাজাদা লাকা রূহী ওয়া জানানী'**। অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমার আত্মা এবং আমার অন্তরও তোমায় সিজদা করেছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, এসব দোয়া শুনে (ভয়ে) আমার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সত্যের প্রতাপের দরুন আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থা দেখে আমি অনুধাবন করি, তিনি সত্য আর অবশ্যই তিনি সফল হবেন। কিন্তু নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মা খারাপ হয়ে থাকে।" সে বার বার প্ররোচিত করে। "তিনি (সা.) নামায পড়ে বের হলে আমি তাঁর পিছু নেই। (আমার) পদধ্বনিতে মহানবী (সা.) বুঝতে পারেন। রাত অন্ধকার ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তরে আমি বলি, আমি উমর। তিনি (সা.) বলেন, **হে উমর! দিন-রাত কখনোই তুমি আমার পিছু ছাড় না?** তখন আমি মহানবী (সা.)-এর আত্মার সুবাস পাই আর আমার আত্মা অনুভব করে, তিনি (সা.) (আমার বিরুদ্ধে) বদ্‌দোয়া করবেন। আমি নিবেদন করি, মহাত্মন! বদদোয়া করবেন না যেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, সেই ক্ষণটি আমার জন্য ইসলাম (গ্রহণের) সময় ছিল,

অবশেষে খোদা তা'লা আমাকে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন।" **(মলফূযাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০-১৮১)**

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি আর এরই বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে কিছুটা বিরতির পর তিনি (আ.) আরেক স্থানে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোও একই কথা কিন্তু তাতে শেষের দিকে দু'একটি শব্দ কিছুটা ভিন্ন ফলাফল বের করেছে। তিনি (আ.) বলেন,

"ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমর (রা.) আবু জাহলের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। বরং লেখা আছে, আবু জাহল একবার মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে আর এজন্য পুরস্কারস্বরূপ কিছু অর্থও ঘোষণা করে। এ কাজের জন্য হযরত উমর (রা.) নির্বাচিত হন। অতএব, তিনি তাঁর তরবারিতে শাণ দেন এবং সুযোগের সন্ধানে থাকেন। অবশেষে হযরত উমর (রা.) জানতে পারেন, মাঝ রাতে কা'বাগৃহে এসে তিনি (সা.) নামায পড়েন। তাই তিনি কা'বাগৃহে এসে লুকিয়ে থাকেন আর তিনি শুনতে পান, জঙ্গলের দিক থেকে **'লা ইলাহা'** ধ্বনি ভেসে আসছে, এভাবে সেই শব্দ নিকটবর্তী হতে থাকে এবং মহানবী (সা.) এসে কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন, এরপর তিনি (সা.) নামায পড়েন। হযরত উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) সিজদায় গিয়ে এত বেশি দোয়া করেন যে, আমার মাঝে তরবারি চালানোর মত আর সাহস অবশিষ্ট ছিল না। তিনি (সা.) নামায শেষ করে সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন আর আমি পিছু পিছু চলতে থাকি। আমার পদধ্বনি শুনতে পেয়ে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তরে বলি, আমি উমর। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে উমর! দিনের বেলায়ও আমার পিছু ছাড় না আর রাতের বেলাও না? হযরত উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর একথা শুনে আমি অনুভব করি, তিনি (সা.) (হয়তো) বদদোয়া করবেন। তাই আমি নিবেদন করি, মহাত্মন! আজকের পর আমি আর আপনাকে কষ্ট দিব না। আরবদের মাঝে যেহেতু অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়, তাই মহানবী (সা.) (আমার কথা) বিশ্বাস করেন। কিন্তু আসলে হযরত উমর (রা.)'র মাহেন্দ্রক্ষণ সন্নিকটে ছিল।" এ প্রসঙ্গে এই কথাগুলো কিছুটা নতুন। "এতে মহানবী (সা.) মনে মনে ভাবেন, তাকে আল্লাহ্ বিনষ্ট করবেন না। অতএব, অবশেষে হযরত উমর (রা.) মুসলমান হন আর এরপর সেই বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক যা আবু জাহল এবং অন্যান্য বিরোধীর সাথে ছিল তা এক নিমিষে ভেঙ্গে যায় আর সেই স্থলে এক নতুন ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপিত হয়। হযরত আবু বকর (রা.) এবং অন্য সাহাবীদের পাওয়ার পর পূর্বের সেই সম্পর্কের কথা আর কখনও মনেও পড়ে নি।" **(মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০)**

আরেকস্থানে হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি তিনি (আ.) সেই একই আঙ্গিকে বর্ণনা করেন, সামান্য কিছু শব্দে হয়তো ভিন্নতা রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে হযরত উমর (রা.)'র যাওয়ার ঘটনা আপনারা শুনে থাকবেন। আবু জাহল জাতির মধ্যে এক প্রকার বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছিল, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে হত্যা করবে সে অনেক অনেক পুরস্কার ও সম্মান লাভের যোগ্য হবে। ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের পূর্বে হযরত উমর (রা.) আবু জাহলের সাথে চুক্তি করেছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি কোন মোক্ষম সুযোগের সন্ধানে ছিলেন। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মধ্যরাতে কা'বাগৃহে নামায পড়ার জন্য আসেন। এটিকে উপযুক্ত সময় ভেবে হযরত উমর

(রা.) সন্ধ্যার দিকে কা'বা শরীফে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। মাঝরাতে জঙ্গল থেকে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** শব্দ ভেসে আসতে থাকে। হযরত উমর (রা.) ঠিক করেন, যখন মহানবী (সা.) সিজদায় যাবেন তখনই হত্যা করব। মহানবী (সা.) গভীর বেদনার সাথে প্রার্থনা আরম্ভ করেন এবং সিজদায় এমনভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন যে, হযরত উমর (রা.)'র মন গলে গেল, তার সব উদ্যম লোপ পেতে থাকে এবং তাঁর হত্যার জন্য উদ্যত হাত শিথিল হয়ে যায়।" হযরত উমর (রা.)'র কোমলতার কথা বলতে গিয়ে তিনি (আ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন। "নামায শেষ করে মহানবী (সা.) যখন বাড়ির পথ ধরেন তখন হযরত উমর (রা.)ও তাঁর পেছনে পেছনে যেতে থাকেন। মহানবী (সা.) পদধ্বনি শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং জানার পর বলেন, হে উমর! তুমি কি আমার পিছু ছাড়বে না? হযরত উমর (রা.) তখন বদদোয়ার ভয়ে বলেন, মহোদয়! আমি আপনাকে হত্যার সংকল্প পরিত্যাগ করেছি। আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন না। হযরত উমর (রা.) বলতেন, এটিই সেই প্রথম রাত ছিল যখন আমার মাঝে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জন্মে।" **(মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

এটি একথা বলার জন্য আমি (যে) পৃথক তিনটি উদ্ধৃতি পড়লাম, (এর) একটি হল ১৯০১ সালের জানুয়ারি মাসের, একটি ১৯০২ সালের আগস্ট মাসের এবং একটি ১৯০৪ সালের জুন মাসের কিংবা সম্ভবত ১৯০৭ সালের। যাহোক, এই তিন স্থানেই তিনি (আ.) রাতের বেলা কা'বা গৃহে {উমর (রা.)'র} আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনার পর সম্ভবত প্রবৃত্তির তাড়নায় পরাভূত হয়ে তিনি (রা.) আবার দিনের বেলায়ও বেরিয়ে থাকবেন, যখন ভাইবোনের সেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যা সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু যাহোক, তিনবারই তিনি (আ.) একথাই বলেছেন। কেননা তিনি নফসে আম্মারা'র কথাও উল্লেখ করেছেন; হতে পারে আবার তাঁর মধ্যে কুপ্ররোচনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন তিনি (হত্যার উদ্দেশ্যে) বের হয়েছিলেন। আর দু'টি ঘটনাতেই তা হোক বোনের ঘটনা বা বোন-ভগ্নিপতি সংক্রান্ত ঘটনা কিংবা রাতের বেলা হত্যা চেষ্টার ঘটনা, তাতে নিশ্চিতভাবে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, আবু জাহলের উস্কানিতে এবং তার পুরস্কার ঘোষণার ফলেই হযরত উমর (রা.) এই সংকল্প করেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আবু জাহলকে ফেরাউন বলা হয়েছে, কিন্তু আমার মতে সে ফেরাউনের চেয়েও জঘন্য ছিল। ফেরাউন তো অবশেষে বলেছিল, آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ **[অর্থাৎ, আমি ঈমান আনছি, সেই সত্তা ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, যার প্রতি বনী ইস্রাঈল ঈমান এনেছে।** (সূরা ইউনুস: ৯১)] কিন্তু এ (আবু জাহল) শেষ পর্যন্ত ঈমান আনে নি। মক্কায় সমস্ত নৈরাজ্যের সে-ই হোতা ছিল আর সে চরম অহংকারী, স্বার্থপর এবং সম্মান ও খ্যাতিলোভী মানুষ ছিল। তার আসল নামও উমর ছিল আর এই উভয় উমর-ই মক্কায় বাস করতো। খোদার প্রজ্ঞা এক উমরকে কাছে টানেন আর অপরজন বঞ্চিত থাকে, তার আত্মা সম্ভবত দোযখে পুড়ছে আর হযরত উমর (রা.) হঠকারিতা পরিত্যাগ করায় বাদশাহ্ হয়ে গেছেন।" **(মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৭)**

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) তিনবার এই দোয়া পড়ে তার বুকে হাত বুলিয়ে দেন যে, **"আল্লাহুম্মা আখরিজ মা ফী সাদরিহী মিন গিল্লিন ওয়াবদিলহু ঈমানা"**, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাঁর হৃদয়ে যে বিদ্বেষ-ই রয়েছে তা দূর করে দাও এবং একে ঈমানে পরিবর্তন করে দাও।

এই দোয়া তিনি (সা.) ৩ বার করেন। **{আল্ ইস্তিআব ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭, বাব উমর বিন আল্ খাত্তাব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

যেমনটি আমরা হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পূর্বের জীবনে দেখেছি যে, মুসলমান হওয়ার পূর্বে হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের চরম বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং সংকট থেকে উত্তরণের কারণ প্রমাণিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, **'হযরত উমর (রা.)'র ঈমান আনার পূর্ব পর্যন্ত আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি নি।'** **{আল্ ইসাবাহ্ ফী তমীযিস্ সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৪, যিকরু উমর বিন আল্ খাত্তাব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আব্দুর রহমান বিন হারিস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, যে রাতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি সেদিন আমি চিন্তা করলাম, মক্কাবাসীদের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর শত্রুতায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী কে? আমি তার কাছে গিয়ে তাকে বলব, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার কাছে মনে হল, সেই আবু জাহলই হবে। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, সকাল হতেই আমি তার বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ি। তিনি (রা.) বলেন, আবু জাহল আমার কাছে এসে বলে, হে আমার ভাগিনা! স্বাগতম। হযরত উমর (রা.)-কে সে বলে, স্বাগতম। তুমি কি মনে করে এসেছ? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমি তোমাকে একথা বলতে এসেছি; আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি। এছাড়া তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমি তাঁর সত্যয়ন করেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা শুনে সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় আর বলে, আল্লাহ্ তোমাকে এবং সেই জিনিসকে ধ্বংস করুন যা তুমি এনেছ। **{সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ১৬২, যিকরু ইসলামু উমর বিন খাত্তাব (রা.), বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত}**

এটি ছিল আবু জাহলের বাক্য।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমার পিতা হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর লোকদের জিজ্ঞেস করেন, কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কথা রটানোর বা প্রচারের অভ্যাস কার মাঝে রয়েছে? তারা বলে, জামিল বিন মা'মার জুমহী। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, তিনি (রা.) প্রত্যুষেই তার কাছে চলে যান আর আমিও তাঁর পিছনে পিছনে যাই। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম, তিনি কী করেন? ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি অল্প বয়স্ক হলেও যা কিছু দেখতাম তা বুঝতে পারতাম। হযরত উমর (রা.) তার কাছে গিয়ে তাকে বলেন, হে জামিল! তুমি কি জানো আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আর মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মে যোগ দিয়েছি? হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি একথা পুনরাবৃত্তি নি, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন পড়ে নি, ইতিমধ্যে সে তার চাদর টানতে টানতে বের হয়ে যায় আর হযরত উমর (রা.)ও তার পিছু নেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমিও আমার পিতার পিছনে পিছনে যেতে থাকি। যেতে যেতে সে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি জামিল কা'বা গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চঃস্বরে বলতে থাকে, হে কুরাইশের দল! (কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে সে এটি ঘোষণা করে,) হে কুরাইশের দল! আর লোকেরা তখন কা'বা শরীফের পাশে নিজ নিজ আসরে বসে ছিল, তারা তার প্রতি দৃষ্টি দেয়। তখন সে বলে, তোমরা শুনে নাও! উমর বিন খাত্তাব (রা.) সাবী হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) তার পিছন থেকে বলছিলেন, সে মিথ্যা বলছে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। সাবী হই নি, বরং আমি ইসলাম

গ্রহণ করেছি আর এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছি যে, **'আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল'**। একথা শুনে কুরাইশরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তাদের সাথে তিনি লড়তে থাকেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে লড়াই হয় আর এভাবে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত চলতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (রা.) ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন আর মানুষ তাকে ঘিরে ধরে। তখন তিনি (রা.) বলছিলেন, তোমরা যা খুশি কর, আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমরা তিনশ' পুরুষ হয়ে গেলে হয় আমরা একে, অর্থাৎ মক্কাকে তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব নয়তো তোমরা একে আমাদের জন্য ছেড়ে দিবে। অর্থাৎ এরপর আমরা স্বাধীনভাবে সব কিছু করব। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের এমতাবস্থায় কুরাইশদের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক ব্যক্তি আসে, যে ইয়েমেনী কাপড়ের একটি নতুন পোশাক এবং নকশা করা জামা পরিহিত ছিল। এমনকি সে তাদের কাছে এসে দাঁড়ায় এবং বলে, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলে, উমর 'সাবী' বা ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। সে বলে, তাতে কী হয়েছে। একজন নিজের জন্য একটি পথ বেছে নিয়েছে। এখন তোমরা কী চাও? তোমরা কি মনে কর যে, বনু আদী বিন কা'ব (গোত্র) তাদের সদস্যকে এমনিতেই তোমাদের হাতে ছেড়ে দিবে? এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম! অতঃপর তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে সরে যায়। হযরত উমর (রা.)'র পুত্র হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি আমার পিতাকে, অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, যখন তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। (অর্থাৎ) মদীনায় হিজরতের বহুদিন পর তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে, হে আমার পিতা! সেই ব্যক্তি কে ছিল, যে মক্কায় আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন মানুষকে ভর্ৎসনা করে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, যখন কিনা তারা আপনার সাথে লড়াই করছিল? তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! সে ছিল আ'স বিন ওয়ায়েল সাহ্‌মী। **{সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ১৬১-১৬২, যিকরু ইসলামু উমর বিন খাত্তাব (রা.), বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত}**

বুখারীতেও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত উমর (রা.) নিজের বাড়িতে ভীত-ত্রস্ত হয়ে বসেছিলেন, তখন আবু আমর আ'স বিন ওয়ায়েল সাহ্‌মী আসে আর সে একটি নকশা করা চাদর এবং একটি রেশমী পাড় দেয়া জামা পরিহিত ছিল। আর সে ছিল বনু সাহ্‌ম গোত্রের সদস্য, যারা অজ্ঞতার যুগে আমাদের মিত্র ছিল। আ'স হযরত উমর (রা.)-কে বলে, তোমার এ কী অবস্থা? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি যেহেতু মুসলমান হয়ে গেছি তাই তোমার জাতি আমাকে হত্যা করতে চায়। সে বলে, তোমার কাছে কেউ পৌঁছতে পারবে না। আ'স এর এই কথায় আমি আশ্বস্ত হই। আ'স এ কথা বলে চলে যায় আর মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে। তখন পরিস্থিতি এরূপ ছিল যে, মক্কা উপত্যকা তাদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। আ'স জিজ্ঞেস করে, (তোমরা) কোথাও যাচ্ছ? তারা উত্তরে বলে, আমরা খাত্তাবের সেই পুত্রের কাছে যাচ্ছি যে ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। সে বলে, তাঁর কাছে যেও না। একথা শুনে মানুষ ফিরে যায়। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব মানাকেব আল্ আনসার, বাব ইসলামু উমর বিন আল্ খাত্তাব, হাদীস নংঃ ৩৮৬৪)**

হযরত উমর (রা.)'র ভীত-ত্রস্ত হওয়ার যে কথা এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তা সঠিক বলে মনে হয় না, কেননা এটি হযরত উমর (রা.)'র প্রকৃতি বিরোধী বিষয়। হতে পারে যে, দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল, যা বর্ণনাকারী ভয় মনে করেছেন, অথবা এমনিতেই, যেমনটি পূর্বেও একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, কিছুকাল পর হযরত উমর (রা.) সেই আশ্রয় ফিরিয়েও দিয়েছিলেন। আর এর উল্লেখ পরবর্তীতেও আসবে। হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের

রেওয়ায়েত সমূহের ব্যাখ্যায় আ'স বিন ওয়ায়েল সাহ্মী'র উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব লিখেন,

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কতিপয় লোক, যারা ঈমান এনেছিলেন, তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের কথাও উল্লেখ রয়েছে এবং বলা হয়েছে, হযরত উমর (রা.)ও মুসলমান হওয়ার কারণে কঠোরতার শিকার হতেন যদি আ'স বিন ওয়ায়েল সাহ্মী তাঁকে আশ্রয় প্রদানের ঘোষণা না করত। আ'স বিন ওয়ায়েল কুরাইশদের সম্মানীত ব্যক্তিদের একজন ছিল আর বনু সাহ্ম গোত্রের সদস্য ছিল। তার বংশধারা হল- আ'স বিন ওয়ায়েল বিন হাশেম বিন সাঈদ বিন সাহ্ম। হিজরতের পূর্বে কাফির অবস্থাতেই সে মৃত্যু বরণ করেছিল। আর হযরত উমর (রা.) ছিলেন বনু আদী গোত্রের সদস্য। বনু আদী ও বনু সাহ্ম গোত্র পরস্পরের মিত্র ছিল। আর উক্ত চুক্তি, মৈত্রী ও সমর্থনের কারণে আ'স বিন ওয়ায়েল হযরত উমর (রা.)'র সাহায্য করাকে নিজের নৈতিক দায়িত্ব বলে জ্ঞান করে। **{সহীহ্ বুখারীর (অনুবাদ), কিতাব মানাকেব আল্ আনসার, বাব ইসলামু উমর বিন আল্ খাত্তাব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬-৩৪৭}**

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, হযরত উমর (রা.) এক সময়ে আ'স বিন ওয়ায়েল-এর আশ্রয় পরিত্যাগ করেছিলেন। পরন্তু, এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি চাচ্ছিলাম না যে, কোন মুসলমানকে প্রহৃত অবস্থায় দেখব অথচ আমাকে প্রহার করা হবে না। তিনি (রা.) বলেন, আমি চিন্তা করলাম– এটি কোন কথা নয়; (তাই) আমারও সেই কষ্টই পাওয়া উচিত যা অন্য মুসলমানরা পাচ্ছে। তিনি (রা.) বলেন, (কিন্তু) আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত থাকি যতক্ষণ না তারা কাবাগৃহে সমবেত হয়। আমি আমার মামা আ'স বিন ওয়ায়েল-এর নিকট যাই এবং বলি, আপনি আমার কথা শুনুন। তিনি বলেন, আমি কী কথা শুনবো? তিনি (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমি আপনার আশ্রয় আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা শুনে তিনি বলেন, হে আমার ভাগ্নে! তুমি এমনটি করো না। তখন আমি বললাম, ব্যাস! এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, ঠিক আছে, তুমি যেমনটি চাও তাই হবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি আশ্রয় ফিরিয়ে দেয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে সম্মানিত করা পর্যন্ত আমি কেবল মার খেতে থাকি এবং মারতে থাকি। **{উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪১, উমর বিন আল্ খাত্তাব (রা.), দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

মুহাম্মদ বিন উবায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আমরা বায়তুল্লাহ্ শরীফে নামায পড়তে পারতাম না। হযরত উমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি সেই কাফিরদের সাথে লড়াই করেন, অবশেষে তারা আমাদেরকে বাধা প্রদানে ক্ষান্ত হয় এবং আমরা সেখানে নামায পড়তে আরম্ভ করি। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৩, ইসলামু উমর (রা.), বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল্ আরাবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সম্মানের সাথেই জীবনযাপন করেছি। **{সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলু আসহাবিন্ নবী, বাব হযরত উমর (রা.), হাদীস নংঃ ৩৬৮৪}**

পরবর্তীতেও অত্যাচার অব্যাহত ছিল, কিন্তু পূর্বের অন্যায়-অত্যাচারের তুলনায় তারা সেসব অত্যাচারকে আর কষ্ট মনে করতেন না। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত উমর (রা.)-কেও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হিশাম (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র হাত ধরে রেখেছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে বলেন, **'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমার নিকট সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়, কেবল আমার প্রাণ ব্যতীত। মহানবী (সা.) বলেন, না, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমার ঈমান ততক্ষণ পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ তোমার প্রাণের চেয়েও আমি তোমার কাছে প্রিয় না হব।'** এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত উমর (রা.) তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করেন, **'আল্লাহ্‌র কসম! এখন থেকে আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ উমর! এখন ঠিক আছে।'** {সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ ঈমান ওয়ান্ নুযূর বাব কাইফা কানাত ইয়ামিনুন্ নবী (সা.), হাদীস নং: ৬৬৩২}

অর্থাৎ, এখন ঠিক আছে। এই ছিল ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ।

হযরত উমর (রা.)'র মদীনায় হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) আমাকে বলেছেন, আমি মুহাজিরদের মধ্যে এমন কাউকে চিনি না যে-কিনা লুকিয়ে হিজরত করে নি, কেবল হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ব্যতীত। তিনি (রা.) হিজরত করার সংকল্প করার পর তরবারি তুলে নেন, ধনুক কাঁধে ঝোলান আর তির এবং বর্শা হাতে নিয়ে কা'বা অভিমুখে অগ্রসর হন। কুরাইশ সর্দাররা (তখন) কা'বা চত্বরেই ছিল। তিনি (রা.) অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে কা'বার চারপাশে সাতবার তওয়াফ করেন। এরপর মাকামে ইব্রাহীমে যান এবং সেখানে প্রশান্তচিত্তে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি (রা.) এক এক করে প্রতিটি গোত্রের নিকট গিয়ে বলেন, তোমাদের চেহারা বিকৃত হোক আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের নাক ধূলোমলিন করুন (অর্থাৎ তোমাদের লাঞ্ছিত করুন)। আর যে ব্যক্তি চায় যে, তার মা সন্তানহারা হোক, তার সন্তানরা এতীম হোক এবং তার স্ত্রী বিধবা হোক, সে যেন এই উপত্যকার ওপারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। হযরত আলী (রা.) বলেন, কয়েকজন দুর্বল প্রকৃতির মুসলমান ব্যতীত কেউই তাঁর পশ্চাদনুসরণ করে নি। তিনি তাদেরকে তথ্য সরবরাহ করেন এবং তাদেরকে পথ দেখিয়ে দেন। এরপর তিনি নিজের পথ ধরেন। {উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪৮-৬৪৯, উমর বিন আল্ খাত্তাব (রা.) হিজরাতুহু, বৈরুতের দারুল্ ফিক্‌র থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}

হযরত উমর (রা.)'র এভাবে প্রকাশ্যে হিজরত করা সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)'র (বর্ণনাকৃত) এই একটি রেওয়ায়েতই রয়েছে যা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ জীবনীকাররা এটি থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। মুহাম্মদ হোসেন হ্যায়কল নামক এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)'র বর্ণাঢ্য জীবনী সম্বলিত একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি তাতে এই বিষয়টির অবতারণা করেন যে, মহানবী (সা.) হিজরতের নির্দেশ দেয়ার সময় বলেছিলেন, নীরবে, নিভৃতে ও লুকিয়ে মক্কা থেকে যাত্রা করবে, যাতে বিরুদ্ধবাদীরা টের না পায়, নতুবা তারা বাধা প্রদান করবে এবং তোমাদেরকে আরো কষ্ট দিবে। মহানবী (সা.)-এর এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.) কীভাবে তা অমান্য করতে পারেন! এছাড়া এর পাশাপাশি তাবাকাত ইবনে সা'দ এবং ইবনে হিশাম-এ স্পষ্টভাবে লেখা আছে, হযরত উমর (রা.)ও অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় গোপনেই হিজরত করেছিলেন। যাহোক, যদি হযরত আলী (রা.)'র বর্ণনাকে কোনভাবে সঠিক আখ্যায়িত করতেও হয় তাহলে হতে পারে কোন এক সময় দাঁড়িয়ে তিনি এই ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু সে সময় হিজরত করেন নি। অর্থাৎ কা'বাতে দাঁড়িয়ে নেতাদের সামনে যখন ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমি যাচ্ছি, পারলে আমাকে ঠেকাও; কিন্তু তখন (হয়তো) হিজরত করেন নি। আর যখন হিজরতের পরিকল্পনা

করা হয় তখন তিনি নীরবে হিজরত করেন। যাহোক, হ্যায়কল এর এ কথাটি নিজের মাঝে গুরুত্ব বহন করে। আর যেমনটি আমি বলেছি, তাবাকাত ইবনে সা'দ ও ইবনে হিশামও তা-ই লিখেছেন। এটিই মনে হয় যে, হযরত উমর (রা.)ও অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে গোপনে হিজরত করেছিলেন। কেননা মক্কার অবস্থা যেরূপ ছিল সে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ্যে এমনটি করা সম্ভব ছিল না। বরং আমরা দেখি, মক্কা বিজয় পর্যন্ত যে-ই হিজরত করেছে সে গোপনে হিজরত করাকেই নিরাপদ মনে করেছে। যাহোক, যদি হযরত আলী (রা.)'র বর্ণনাকে সঠিক বলেও ধরে নেয়া হয়, তাহলে হতে পারে এটি ব্যক্তিগত কাজ ছিল। কিন্তু বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণে এটিই মনে হয় যে, তা সঠিক নয়। **{মুহাম্মদ হোসেইন হ্যায়কল রচিত 'আল্ ফারূক উমর', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৩-৫৪, বাব ফী সুহবাতুন্ নবী (সা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত}**

হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, মুহাজিরদের মাঝে সর্বপ্রথম যিনি আমাদের কাছে আসেন তিনি ছিলেন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.), যিনি বনু আব্দুদ্ দ্বার গোত্রের সদস্য ছিলেন। এরপর হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) আসেন, যিনি অন্ধ ছিলেন এবং বনু ফেহের গোত্রের সদস্য ছিলেন। এরপর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বিশজন লোকের সাথে বাহনে চড়ে আসেন। আমরা মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি (সা.) আমার পিছনেই রয়েছেন অর্থাৎ, কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসবেন। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) আগমন করেন আর তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর (রা.)। **{উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

যদি এ বর্ণনাটি সঠিক হয়, তাহলে অধিক সম্ভাবনা এটাই যে, হযরত উমর (রা.) কোন এক সময়ে কোন বৈঠকে হিজরতের উল্লেখ করে থাকবেন আর আবেগের আতিশয্যে বলে থাকবেন যে, পারলে আমাকে ঠেকিয়ে দেখাও! কিন্তু হিজরত গোপনেই করেছিলেন। কেননা বর্ণনায় এটিও এসেছে যে, বিশজন তাঁর সাথে ছিলেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। হযরত উমর (রা.) মদীনায় পৌঁছে কুবায় রিফা' বিন আব্দুল মুনযের-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

যেমনটি আমরা জানি, কুবা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উঁচু স্থান। আর এখানে আনসারদের কয়েকটি গোত্র বসবাস করত। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল আমর বিন অওফ-এর গোত্র। সেই গোত্রের নেতা ছিলেন কুলসুম বিন হিদম। কুবা পৌঁছে মহানবী (সা.) তার বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন। **(ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ২৩০)**

হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ববন্ধন সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনানুসারে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। কিন্তু এ ভ্রাতৃত্ববন্ধনও দু'বার স্থাপিত হয়েছিল। একবার মক্কায় আর আরেকবার হিজরতের পরে মদীনায়। মক্কায় যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন সে সময় মহানবী (সা.) নিজের সাথে হযরত আলী (রা.)-কে রেখেছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। যাহোক, ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের এ দু'টি পৃথক ঘটনা। মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেছিলেন। একটি বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.) হিজরতের পর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং হযরত উওয়ায়েম বিন সায়েদাহ্ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

আরেকটি বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)'র সাথে স্থাপন করেছিলেন। অপর এক বর্ণনানুসারে হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত মু'আয বিন আফরা (রা.)'র সাথে স্থাপন করেছিলেন। **{সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল্ ইবাদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩, ফী মওয়াখাতিহি (সা.) বাইনা আসহাবিহ্ রাযিআল্লাহু আনহুম, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৬, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত}**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)'র সাথে স্থাপিত হয়েছিল। **(সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃঃ ২৭৭)**

আযানের প্রচলন কীভাবে হয়েছিল- এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, আমরা প্রভাতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই এবং আমি তাঁকে (সা.) আমার স্বপ্ন শোনাই। এ ঘটনাটি হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণের সময়ও উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন যেহেতু হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে, তাই উক্ত ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে কিছুটা উল্লেখ করছি অথবা অন্য রেওয়ায়েতের আলোকে বলে দিচ্ছি। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছ, নিঃসন্দেহে এটি সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলাল (রা.)'র সাথে যাও, কেননা তোমার তুলনায় বেলালের স্বর উঁচু এবং সে (বিভিন্ন) ঘোষণাও দিয়ে থাকে। (স্বপ্নে) তোমাকে যা বলা হয়েছে, তুমি তাকে বলতে থাক, বেলাল তা ঘোষণা করতে থাকবে। তিনি অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন নামাযের জন্য হযরত বেলাল (রা.)'র আহ্বান শুনেন, তখন তিনি (রা.) নিজের চাদর গুটাতে গুটাতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয় আমিও (স্বপ্নে) ঠিক সেরূপই দেখেছি যেরূপ সে আযানে বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র, (এখন) বিষয়টি আরো সুদৃঢ় হল। **(সুনান তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত বাব মা জায়া ফী বাদইল আযান, হাদীস নং: ১৮৯)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'মহানবী (সা.)-এর যুগে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) নামের একজন সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে আযান শিখিয়েছিলেন। আর মহানবী (সা.) তাঁর সেই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে মুসলমানদের মাঝে আযানের রীতি প্রচলন করেন। পরবর্তীতে কুরআনের ওহীও উক্ত বিষয়টির সত্যায়ন করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা এই আযানই শিখিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ দিন পর্যন্ত আমি নিশ্চুপ থাকি- এই চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই অন্য একজন মহানবী (সা.)-এর কাছে বিষয়টি বর্ণনা করেন। যেহেতু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছিল, তাই আমি নীরব ছিলাম তথা, বর্ণনার আর প্রয়োজন নেই। এর প্রতিই মহানবী (সা.)-এর হাদীস ইশারা করে **"আল মু'মিনু ইয়ারা আও ইউরা লাহু"** অর্থাৎ মু'মিনকে কখনো সরাসরি সুসংবাদ প্রদান করা হয় আর কখনও কখনও অন্যের মাধ্যমে তাকে সংবাদ পৌঁছানো হয়'। **(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬২৪-৬২৫)**

বাকি আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্ ।

এখন সংক্ষিপ্তভাবে আমি এদিকেও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আজ রমযানের শেষ জুমু'আ। এটিকে কেবল রমযানের শেষ জুমুআ হিসেবে পরিগণ্য করবেন না, বরং এ জুমুআ আমাদের ভবিষ্যতের জন্য নতুন পথ উন্মোচনকারী হওয়া উচিত। রমযানে

যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে আর যেসব পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য হয়েছে- সেগুলোকে রমযানের পরও আমাদের অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা উচিত, বরং এক্ষেত্রে আরো উন্নতি সাধন করা উচিত। যদি আমরা এসব পুণ্যকর্ম এবং পবিত্র পরিবর্তন ধরে না রাখি এবং এক্ষেত্রে উন্নতি সাধন না করি তাহলে রমযান মাস অতিবাহিত করা আমাদের জন্য অর্থহীন। বিগত জুমুআয় আমি দরূদ ও এস্তেগফারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। তা কেবল রমযান (মাস) পর্যন্তই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে, অর্থাৎ রমযানও অতিক্রান্ত হল আর আমরাও জাগতিক কাজেকর্মে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়লাম যে, দোয়া এবং এস্তেগফারের কথাই ভুলে গেলাম (এমন যেন না হয়)। এদিকে ইশারা করেই আমি বিশেষভাবে বলেছিলাম, আমাদের এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে। বর্তমান যুগে, যখন দাজ্জালি ষড়যন্ত্র নতুন নতুন অস্ত্র ব্যবহার করছে, জাগতিক চাকচিক্য অধিকাংশ মানুষকে নিজের বেড়াজালে আবদ্ধ করছে, আমাদের যুবকরা আর অনেক সময় শিশুরাও সেই চাকচিক্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আমাদের নিজেদের জন্যও অনেক দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শয়তানি ও দাজ্জালি আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন।

এছাড়া নিজ সন্তানদেরকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত রেখে, নিজেদের সাথে আবদ্ধ করে, নিজের সাথে তাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব এবং ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করাও আবশ্যক আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়ে, সন্তানদের হৃদয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি করে– তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দিন, যেন তাদের কোন কাজ, আচার-আচরণ, কর্ম এবং চিন্তাভাবনা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি পরিপন্থী না হয়, তাঁর শিক্ষা পরিপন্থী না হয়। পার্থিব জগতের সকল মতাদর্শ এবং নৈরাজ্যের উত্তর যেন তাদের জানা থাকে। এমনটি যেন না হয় যে, কিছু প্রশ্নের উত্তর না জানার দরুন তারা অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। (এসব নৈরাজ্যের) সঠিক প্রত্যুত্তর জেনে তারা যেন নিজেদেরকে সেসব নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। এটিই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জীবনকে সুন্দর ও নিরাপদ করার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। আর সকল প্রকার নৈরাজ্য থেকে নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য এটিই সঠিক পদ্ধতি। কিন্তু যতক্ষণ আমরা নিজেরা ঈমান ও বিশ্বাসের উচ্চমানে উপনীত হতে না পারব, ততদিন এমনটি করা সম্ভব হবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সম্ভব হবে না যতক্ষণ আমরা সেই মানে না পৌঁছব যেটি এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় হবে। আমাদের নামায এবং আমাদের ইবাদত উন্নত মানের হবে। (এটি তখনই সম্ভব হবে) যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার প্রকৃত দায়িত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। এটি আমাদের স্কন্ধে অর্পিত অনেক বড় একটি দায়িত্ব, আমরা যেন নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে, নিজেদের ব্যবহারিক কর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার মাধ্যম হই। বর্তমানে নির্লজ্জতা ও অশালীন কাজকর্মের যতটা ছড়াছড়ি, সম্ভবত এর পূর্বে এতটা কখনোই ছিল না। টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে এখন সবকিছু হাতের মুঠোয়। পূর্বে বাড়ির বাইরে গেলে বিপদের আশঙ্কা থাকতো, আর এখন তো বাড়ির ভেতরেও বিপদ। শিশুরা লুকিয়ে বসে দেখতে থাকে, কেউ জানতেও পারে না যে, তারা কী দেখছে। কাজেই, অনেক বেশি সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

যারা বুযূর্গদের বা প্রাথমিক যুগের আহমদীদের সন্তান, বা এমন আহমদীদের সন্তান যারা নিজেরা বয়আত করে আহমদী জামাতভুক্ত হয়েছেন, যুগ ইমামকে মেনেছেন এবং নিজেদের ঈমানের সুরক্ষার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন এবং তা করেছেন, কুরবানী দিয়েছেন, তাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আমরাও যদি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে আমাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হই, তবেই আমরা নিজেদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে সক্ষম হবো। কোন বংশ তা সে যে বংশই হোক না শুধুমাত্র একজন বুযূর্গ ব্যক্তির পরিবারের সদস্য হওয়া বা বুযূর্গ ব্যক্তির সন্তান হওয়া কোন আহমদীর জন্য এই নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করতে থাকবেন বা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারিক আচার আচরণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আমাদের কর্মকাণ্ডই আমাদের পরিত্রাণের কারণ হবে। কারও আত্মীয়তার সম্পর্ক বা কারও বংশ পরিচয় কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই এর জন্য সর্বদা অনেক দোয়া করাও প্রয়োজন। ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে নিজেদের দুর্বলতার প্রতিও দৃষ্টি দেয়া উচিত। নিজেদের সন্তান-সন্ততির জাগতিক উন্নতির চাইতে ধর্মের ক্ষেত্রে বেশি উন্নতি সাধনের জন্য দোয়া করা উচিত। জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য আমরা অনেক দোয়া করে থাকি, ধর্মীয় বিষয়াদিতে উন্নতি সাধনের জন্য এর চাইতেও বেশি দোয়া করা উচিত।

একইভাবে যারা নিজেরা বয়আত করে আহমদী হয়েছেন, তাদেরও নিজেদের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডকে এই ধারায় পরিচালিত করতে হবে, তবেই আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্থায়ীত্ব লাভ করবে। অতএব, রমযানের এই অবশিষ্ট দিনগুলোতে এর জন্যও অনেক দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধর্মকে নিরাপদ রাখেন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। (এ দোয়া করুন) রমযানের পরেও যেন আমাদের ইবাদতের মান ক্রমশ উন্নততর হতে থাকে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। আমরা যেন দাজ্জালের প্রতারণার ফাঁদ থেকে নিরাপদ থাকি। শুধুমাত্র জাগতিক আরাম-আয়েশ যেন আমাদের লক্ষ্য না হয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে সে সব ধর্মীয় ও পার্থিব নিয়ামতে ভূষিত করেন যেগুলো আমাদেরকে আরো বেশি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী করবে এবং সর্বদা তাঁর সামনে বিনত রাখবে আর আমাদেরকে সর্বদা তাঁর বিশ্বস্ত বান্দা বানিয়ে রাখবে।

অনুরূপভাবে এই বিষয়ের প্রতিও (আপনাদের) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের যে মহামারি গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে নিয়েছে, এ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার দয়া লাভের জন্যও বিশেষভাবে অনেক দোয়া করুন। একইভাবে যেসব দেশে আহমদীয়াতের বিরোধিতা তুঙ্গে রয়েছে এবং যাদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছে তাদের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জীবনযাত্রা সহজসাধ্য করুন। পাকিস্তানের আহমদীদের এ দিনগুলোতে এবং পরবর্তীতেও সর্বদা বিশেষভাবে সদকা-খয়রাত এবং দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত। আমাদের এসব দোয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের এই প্রচেষ্টা শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। **"রাব্বি কুল্লু শাইয়্যিন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী"** এবং **"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরুরিহিম"** এই দোয়াগুলো অধিক হারে পাঠ করুন, কিন্তু এটিও স্মরণ

রাখবেন, শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব দোয়া কোন কাজে আসে না। মানুষ চিঠি-পত্রে জিজ্ঞেস করে যে, আমি কোন দোয়া করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের নামায সুন্দরভাবে না পড়বো, যতক্ষণ আমরা এর প্রাপ্য যথাযথভাবে পালন না করব ততক্ষণ শুধুমাত্র দোয়া কোন কাজে আসে না। রমযান মাসে যেভাবে নামাযের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়, তা এর পরেও অব্যাহত থাকা উচিত, কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রকৃতপক্ষে লাভ করতে সক্ষম হব।

একইভাবে সকল প্রকার ফিতনা বা নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রমযান মাসের আর যে মাত্র চার পাঁচ দিন অবশিষ্ট আছে, তা সফলতার সাথে অতিক্রম করার তৌফিক দিন। এছাড়া আমরা যেন রমযানের পরও এসব পুণ্যকাজ ধরে রাখতে পারি। এটিও স্মরণ রাখবেন, আমরা আমাদের দোয়ার পরিধি যত প্রশস্ত করব ততই আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ আমাদের ওপর বর্ষিত হবে। তাই বিশেষভাবে প্রত্যেক আহমদীকে সকল আহমদীর সর্বপ্রকার সমস্যা দূরীভূত হওয়ার জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত। এর ফলে মনের অজান্তে পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের অংশ তো লাভ হবেই, পাশাপাশি এই ব্যবহারিক উপকারও হবে, অর্থাৎ (নিজেদের মধ্যে) অনেক বেশি প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

সার্বিকভাবে মুসলিম উম্মতের জন্যও দোয়া করুন। যে দিকে তারা অগ্রসর হচ্ছে এবং যারা যুগের ইমামকে অস্বীকার করে নিজেদের ইহ ও পরকালকে নষ্ট করছে, তা থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। মানবতার জন্য সামগ্রীকভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সুপথে পরিচালিত করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা লাভের সৌভাগ্য দিন। যাহোক, আমাদের কাজ হল দোয়া করা, দোয়া করা এবং দোয়া করতে থাকা, রমযান মাসে এবং রমযান মাসের পরেও। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, (আমীন)।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ থেকে ৩১ মে, ২০২১, পৃঃ ১০-১৫)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)